বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের প্রেক্ষিতে

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর বক্তব্যঃ

আমরা জানতে পেরেছি যে, বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ও সদস্যবৃন্দ ১৬ - ১৯ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় সফর করবেন। আমরা তাদের এই সময়োপযোগী সফরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। তবে তাদের এই সফর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এই সীমিত সময়ে তাঁরা সাধারণ জনগণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিগণসহ সকল মহলের সাথে অবাধে ও খোলাখুলিভাবে সাক্ষাত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভয়াবহ মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কতটুকু অবগত হতে সক্ষম হবেন তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিশেষত তার কার্যসুচিতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি না থাকা অত্যন্ত দুঃখজনক, কারণ সারা দেশের মতো এখানেও সাধারণ জনগণের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরাও চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন। তদূপরি এখানে দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর এবং বিশেষত ইউপিডিএফের উপর নির্দয় দমনপীড়ন চলে আসছে। কাজেই কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান যদি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথেও সাক্ষাতের কর্মসুচি রাখতেন তাহলে এখানকার পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে তা কিছুটা হলেও সহায়ক হতো বলে আমরা মনে করি।
এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা কমিশনের সফরকে ইতিবাচক হিসেবে দেখতে চাই এবং নিচে অতি সংক্ষেপে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিকের প্রতি আলোকপাত করতে চাই।

১। **সাধারণ কথাঃ** বিপুল সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির ভারে ন্যুব্জ পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের স্বর্গপুরী। দশকের পর দশক ধরে এখানে গণহত্যা, খুন, গুম, নির্যাতন, বেআইনী গ্রেফতার-আটক, ধর্ষণ, সাম্প্রদায়িক হামলা, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, ভূমি বেদখল, ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, ধর্মীয় পরিহানি ইত্যাদি জঘন্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এমনকি ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও তা বন্ধ হয়নি। বরং কোন কোন দিক দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি চুক্তি-পূর্ব পরিস্থিতির চাইতেও ভয়াবহ। উদারহণস্বরূপ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর গত ২৫ বছরে এই অঞ্চলে ১৯টির মতো বড় আকারের হামলার ঘটনা ঘটেছে, যাতে বহু নিরীহ পাহাড়ি প্রাণ হারিয়েছে, তাদের শত শত ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকার মূল্যবান সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। বলা হয় চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু গত ২৫ বছর পরও এখানে শান্তি অধরা রয়ে গেছে। অপারেশন উত্তরণের নামে এখনও অঘোষিত সেনাশাসন বলবৎ রয়েছে এবং জনগণের শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনের জন্য দৃশ্যতঃ কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সির কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সেটাই ঘটছে।

২। **রাজনৈতিক দমনপীড়নঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক দমনপীড়ন অতীতে ঘটে থাকলেও, বর্তমানে তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউপিডিএফ একটি গণতান্ত্রিক দল হওয়া সত্ত্বেও তাকে তার সংবিধান-স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পার্টির সকল অফিস জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ সভাসমাবেশে বার বার বাধা দেয়া হয়েছে। এমনকি প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় অত্যন্ত সাধারণ একটি পোস্টার সাঁটানোর গণতান্ত্রিক অধিকারও পার্টিকে দেয়া হয় না। গত ২৪ বছরে পার্টির ২৭ জন সদস্য ও সমর্থককে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক বিচার-বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকায় গুম হওয়া ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমার সন্ধান কিংবা মুক্তি সরকার এখনও দেয়নি। শত শত নেতাকর্মীকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, পার্টির প্রায় প্রত্যেক সদস্যকে মিথ্যা মামলা ও হুলিয়ায় জর্জরিত

করা হয়েছে। আটকের পর মহামান্য আদালত কর্তৃক জামিনে মুক্ত হওয়ার পরও জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার করা হচ্ছে।

৩। **ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসঃ** শাসকগোষ্ঠীর একটি বিশেষ অংশের সৃষ্ট ও মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাস পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন প্রাত্যহিক ঘটনা। মূলতঃ শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্যই এই বাহিনীগুলো গঠন করে দেয়া হয়েছে। এদের হাতে আজ পর্যন্ত ৪৮ জন ইউপিডিএফের নেতা, কর্মী ও সমর্থক খুন হয়েছেন। এদের জঘন্যতম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি হলো ২০১৮ সালের ১৮ আগস্ট খাগড়াছড়ি শহরে স্বনির্ভর গণহত্যা, যেখানে পুলিশ ও বিজিবির সামনে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করে ৭ জনকে হত্যা করা হয়।[১] এ ধরনের খুন-গুম-অপহরণের আরও অনেক ঘটনা রয়েছে, যা সঙ্গত কারণে এখানে বিস্তারিত তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে এই প্রসঙ্গে কেবল এটা বলা যথেষ্ট হবে যে, ২০১৭ সালের ১৫ নভেম্বর এই ধরনের একটি ঠ্যাঙারে বাহিনী গঠনের পর তারা নিজেদেরকে 'গণতান্ত্রিক' দাবি করে রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠে। গঠনের ২০ দিন পর ৫ ডিসেম্বর রাঙামাটির নানিয়াচরের দজর পাড়ায় অনাদি রঞ্জন চাকমাকে গুলি করে হত্যার মাধ্যমে তাদের এই খেলা শুরু হলেও তার শেষ কোথায় তা তাদের মদদদাতারা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এই ঠ্যাঙারে বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পের পাশে অথবা জেলা ও উপজেলা শহরে প্রকাশ্যে সশস্ত্রভাবে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে খুন, অপহরণ ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে থাকে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝার জন্য অতি সাম্প্রতিক দু'টি তথ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রথমটি হলো, গত ১০ই জানুয়ারি ঠ্যাঙারে বাহিনীর একটি দল রাঙামাটির নানিয়াচরে খারিক্ষ্যং আর্মি ক্যাম্পের অনতিদূরে বীর শ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ স্মৃতিসৌধের পাশে অবস্থান নেয় এবং কাপ্তাই লেকে অবস্থিত উক্ত স্মৃতিসৌধে বেড়াতে যাওয়া ছাত্রদের বহনকারী একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে এতে কেউ হতাহত হয়নি। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ১ নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের থলিপাড়া নামক গ্রামে। গত ১১ জানুয়ারি রাতে ঠ্যাঙারে বাহিনী ও সাদা পোষাকধারী কতিপয় সেনা সদস্য নবরতন ত্রিপুরা (বয়স ৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে বিজিতলা আর্মি ক্যাম্পে (সাব-জোন) নিয়ে যায়। সেখানে সারা রাত নির্যাতন চালিয়ে পরদিন তার হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। এদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের শেষ নেই। এক কথায় বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আজ তাদের কাছে জিম্মি। যেহেতু তাদের পেছনে শক্তিধর বাহিনী রয়েছে তাই জনগণ সাধারণত তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খোলার সাহস পায় না। সরকারের পক্ষ থেকে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অর্থাৎ এই ঠ্যাঙারে বাহিনীগুলো ভেঙে দিয়ে এর হোতাদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা কিংবা মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়।

৪। **সাম্প্রদায়িক হামলাঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা প্রায়শ ঘটে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ের দুটি হামলার ঘটনা হলো ৫ জুলাই ২০২২ খাগড়াছড়ির মাইসছড়ির জয়সেন পাড়ায় সেটেলার কর্তৃক পাহাড়িদের বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এবং এই বছর ১ জানুয়ারি বান্দরবানের লামায় রেংয়েন কার্বারী পাড়ায় লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক ম্রোদের বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাট। উল্লেখ্য উভয় হামলার উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম থেকে পাহাড়িদের উৎখাত করে তাদের জমি জোরপূর্বক দখল করা। হামলাকারীদের পেছনে শক্তিশালী পক্ষ জড়িত রয়েছে এবং সে কারণে তাদের কাউকে আজ পর্যন্ত বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি।

[১] জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ ঘটনার তদন্ত করেছিল। কিন্তু তার রিপোর্ট দেশবাসীর সামনে এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

৫। **ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি প্রধান রূপ হলো ভূমি বেদখল। সাম্প্রদায়িক হামলার সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই রূপের মৌলিক ভিত্তি সৃষ্টি হয় যখন ১৯৭৯ - ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আনুমানিক ৪ লক্ষ সমতলবাসী বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়। সেই পর থেকে ভূমি সমস্যা পাহাড়িদের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়িদের জমি কেড়ে নেয়ার জন্য একের পর এক হামলা, লুটপাট চালানো হয়, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং এর ফলে পাহাড়িদের জাতিগত অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে পড়েছে। ইদানিংকালে জমি বেদখলজনিত সমস্যা সবচেয়ে বেশী তীব্র আকার ধারণ করেছে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি এলাকায়। সেখানে সেটেলাররা পাহাড়িদের জমি বেদখল করতে জোর তৎপরতা জারি রেখেছে। অন্যদিকে পাহাড়ি ভুক্তভুগীরা প্রতিকার পাওয়ার জন্য স্থানীয় সামরিক বেসামরিক কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হলেও কোন সহায়তা পাচ্ছে না।
জমি বেদখল কেবল সেটেলারদের দ্বারা নয়, কখনও উন্নয়ন, শিল্প কারখানা স্থাপন, কখনও সেনা ক্যাম্প নির্মাণ বা সম্প্রসারণ, পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন অজুহাতে পাহাড়িদের জমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে। আর এতে পাহাড়িরা নিজ ভূমি থেকে উৎখাত হচ্ছে। এসব ভূমি বেদখলের ঘটনার কোন ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী ভূমি কমিশন গঠন করা হলেও এই কমিশন আজ পর্যন্ত একটি ভূমি মামলাও নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি বর্তমানে নিরাপত্তা বাহিনীর দমনপীড়নের কারণে পাহাড়িরা এতই ভীত সন্ত্রস্ত যে, তারা ভূমি বেদখলকারী সেটেলারদের বিরুদ্ধে মামলা করতে কিংবা বাধা দিতেও ভয় পাচ্ছে। অন্যদিকে কোনভাবে সাহস করে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা হলে বেদখলকারী সেটেলাররা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় পাহাড়িদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে।

৬। **নারীর প্রতি যৌন সহিংসতাঃ** পাহাড়ি নারীদের আজ ঘরে বাইরে কোথাও নিরাপত্তা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবত যেসব ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছে তার কোনটির বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি। ১৯৯৬ সালে কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের এখনও শাস্তি হয়নি। এই বিচারহীনতার কারণে অপরাধীরা বার বার পাহাড়ি নারীদের উপর যৌন হামলা চালানোর সাহস পাচ্ছে। গত বছর পাহাড়ে কমপক্ষে ১৬টি যৌন সহিংসতার ঘটনা তারই প্রমাণ। এছাড়া কয়েকদিন আগে, গত ৫ জানুয়ারি বান্দরবানের সুয়ালক ইউনিয়নে ৩৮ বছর বয়সী তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের এক নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

উপরোল্লেখিত ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন ছাড়াও সেনা অপারেশনের নামে দিনে কিংবা রাতে ঘরবাড়িতে তল্লাশী, হয়রানি, শারীরিক নির্যাতন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ, ধর্মীয় পরিহানি, ঘরবাড়ি নির্মাণে ও মেরামতে বাধা প্রদান, প্রতারণা করে ধর্মান্তরিত করা ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটছে। এছাড়া গত বছর বান্দরবানে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' দমনের নামে নিরাপত্তা বাহিনীর অপারেশনের সময় জনগণের ওপর জুলুম চালানো হলে বম জাতিগোষ্ঠীর কয়েক শত সদস্য ভারতের মিজোরামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা বাংলাদেশ সরকারের একটি দায়িত্ব। অথচ এ লক্ষ্যে কোন ধরনের তৎপরতা এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এই যে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে, সরকার তা দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে আড়াল করতে চায়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনকে পাহাড়ে ঢুকতে দেয়া হয় না এবং গত বছর আগস্ট মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেতকে বাংলাদেশ সফর করার অনুমতি দেয়া হলেও তাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। এখানে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা না করে বরং এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা এ পরিস্থিতিকে আরও বেশী জটিল ও নাজুক করে তুলতে সহায়ক হবে। উদারহণস্বরূপ, সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামে এপিবিএন ও র‍্যাব মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে বিপুল সেনা, বিজিবি ও অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির পরও এপিবিএন ও র‍্যাব মোতায়েন করা হলে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি আরও বেশী অশান্ত ও ভয়ার্ত হয়ে উঠবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও বৃদ্ধি পাবে। অথচ সরকারের উচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাগুলোর সমাধানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক সংলাপের উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রক্রিয়া জোরদার করা।
কারণ যে কোন অঞ্চলের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো শান্তি ও স্থিতিশীলতা। আর জনগণের মানবাধিকার নিশ্চিত না করে কখনই কোন অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন করা যায় না। তাই সবার স্বার্থে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো একান্তভাবে আবশ্যক। আমরা আশা করি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ লক্ষ্যে যথাযথ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হবে। কমিশনের কর্মের পরিধির সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে আমরা কমিশনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি:

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করে রিপোর্ট প্রকাশ করুন এবং লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকারকে সঠিক ও যুক্তিযুক্ত পরামর্শ দিন। কমিশনের দেয়া পরামর্শ মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকারকে তাগাদা দিন।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতি তদারকি ও পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশনে একটি বিশেষ ডেস্ক বা সেল বা বিভাগ গঠন করুন।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঠিক ও বস্তুনিষ্ট চিত্র তুলে ধরতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর রিপোর্ট প্রকাশ করুন।

৪। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর নজরদারি বাড়ানোর লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় কমিশনের শাখা অফিস চালু করুন, এতে স্থানীয় সৎ ও আস্থাভাজন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং মানবাধিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে নিয়মিত সেমিনার, আলোচনা সভা, পরামর্শ সভা ইত্যাদির আয়োজন করুন।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী ও সেটেলারদের ওপর চাপ দিন।

৬। বিশেষ মহলের সৃষ্ট ও মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাস বন্ধ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চাপ দিন এবং চাঞ্চল্যকর স্বনির্ভর গণহত্যাসহ এই বাহিনীগুলোর দ্বারা সংঘটিত সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্ত করুন।

১৫ জানুয়ারি ২০২৩

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)
কেন্দ্রীয় কমিটি

ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। ১৫/০১/২০২৩